বৈরাগ্য মানে বাস্তব থেকে নির্বাসন নয়; বৈরাগ্য হল জীবন-উত্তরণ, বৈরাগ্য তোমার সম্পদ।
—শ্রীশ্রী প্রভুজী
চরণাশ্রিত
জনৈক ভক্ত, অণ্ডাল

ঊর্ধ্বগামী চেতনার বার্তাবহ

উৎসর্গী

বাংলা মাসিক পত্রিকা

আমাদের বেদান্ত শিক্ষা দিয়েছে 'চরৈবেতি'। শুধু কথার কথা নয়, এ হল শাশ্বত সত্য।
—শ্রীশ্রী প্রভুজী
জবা মুখার্জী
অজবীথি

আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ একবিংশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা মূল্য ৫ টাকা বার্ষিক মূল্য ৫০ টাকা সডাক ৫৫ টাকা
Regd. No.- WBBEN/2000/1125 Postal Registration No. P.M.G. (SB)-294/BKU)/RNP-13 Amarkanan BO

প্রভুবাণী

আমরা স্বরূপত সুন্দরের পূজারী। এই পূজায় ধর্মান্ধতা নেই, গোঁড়ামি নেই, সংকীর্ণতা নেই। এখানে আস্তিক নাস্তিক উভয়েরই পথ খোলা। কারণ সুন্দরের আরাধনা কারো একচেটিয়া অধিকার নয়। ছাড়তে হবে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাকে ভাবনাকে, পরিবর্তে ধরতে হবে বিশ্বজনীন ভাবাদর্শকে। এই ভাবাদর্শ যতই জীবনে ফুটে উঠতে থাকবে, জীবনে বাস্তবায়িত হবে, ততই সুন্দরের দিকে জীবন আপন গতিতেই এগিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে হিংসা প্রতিহিংসার সুতীব্র পিপাসা কমতে থাকবে। আজ হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। সভ্যতার উচ্চশিখরে পৌঁছে হিংসার সর্বোচ্চ প্রকাশই যেন সভ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মাপকাঠি কি আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি? মানবকল্যাণের পথে একে কাজে লাগিয়ে কি সফল হতে পেরেছি? সুচিন্তিত মনের নিকট উত্তর খুঁজলে অবশ্যই নেতিবাচক দিকটাই উঠে আসবে। কারণ সত্যসুন্দর বর্জিত যে ভাবনা যে আদর্শ তা হল মানবতাঘ্ন বিরোধী। সত্যসুন্দরের উপাসনার মাধ্যমেই আমাদের পথ ধরতে হবে। যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকেই তা সম্ভব। কারণ কোনো মতবাদ, সম্প্রদায়ঘ্নবর্জিত যে ভাবনা, তাই হল বেদান্ত। এই বিশ্বজনীন ভাবনাই আজকের পৃথিবীর বাঁচার রাস্তা। এই বিশ্বজনীন ভাবনার উদয় হোক সকলের অন্তরে---এই শুভকামনা।

তোমার চেতনার কাছে অকপট হও। বাইরে থেকে কিছু আসবে না। স্বকীয় চেতনার তীব্র অনুরাগই তোমায় দেখাবে তোমার পথ। পূর্ণই অপূর্ণতায় নিজেকে ঢেকে এগিয়ে চলেন পূর্ণতার দিকে। তাই বাইরের কর্ম-কোলাহলে নিজেকে বিস্মৃত না হয়ে সর্বদাই সজাগ থেকো স্বরূপ চেতনায়।
—শ্রী শ্রী প্রভুজী
জনৈক ভক্ত
করুণাময়ী
কলকাতা

তাঁরই ভাবনায়

আদর্শই জীবনের পাথেয়

পরমারাধ্য প্রভুজী বলেন, ''আদর্শই শুধু স্থায়ী, শাশ্বত এবং প্রেরণার উৎসস্বরূপ; আনন্দস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ। বাকি সমস্তই ক্ষণস্থায়ী। আদর্শই যুগ যুগ ব্যাপী জাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।'' তাই আমাদের জীবনের সার্থকতার জন্য আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। আদর্শের প্রতি সচেতনতাই জীবন গঠন করতে সাহায্য করে। আমরা জন্মাই আর জন্মের পর নেহাতই জৈবিক উপাদানের সহায়তায় বড়সড় হয়ে উঠতে থাকি। দেহগত বাড়বৃদ্ধির জন্য সুস্থতা আর খাদ্যানুকুল্য থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে আমরা যখন সচেতন হই যে আমরা মানুষ। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার পরও আমাদের আরও কিছু করার থেকে যায়, আর তা এমনই স্বাভাবিক যে তা যখন যেখানে হয় না সেখানেই অনাবশ্যক ঘুন ধরতে থাকে। আর সেই বিকৃতি যে কখন কীভাবে আসবে তা জানা নেই। অথচ তা যে আসবেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

আসলে যা সত্য, যা সুন্দর তাকে গ্রহণ করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে তৈরি হতে থাকে তখন থেকে যখন থেকে আমরা নৈতিকতার গুরুত্ব বুঝতে পারি। নৈতিকতা আমাদের প্রথম দেহাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটাবার চেষ্টা করে। কারণ তার মধ্যে দিয়েই আমরা শুধুমাত্র আমার আনন্দকে অতিক্রম করে অপরের প্রতি একটা বোধকে জাগিয়ে তুলি। যার থেকে একদিন বৃহতের চিন্তা বৃহতের ভাবনা রূপ গ্রহণ করতে থাকে। পরমারাধ্য প্রভুজী বলেন, ''শিক্ষার অর্থ হল আমি নই তুমি, তোমার আনন্দই আমার আনন্দ, তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ। এই ভাব আর ভাবনাতেই মানুষের মনুষ্যত্ববোধের বিস্তার। শুধুমাত্র নিজের ছেড়ে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা দেয়। এভাবে জীবন ধারণ করে জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ পাল্টে দেওয়া যায়। আদর্শ তাই মানুষের মনুষ্যত্বকে প্রমাণের হাতিয়ার। আদর্শের ধারণা যেমন স্পষ্ট হওয়া দরকার তেমনই প্রয়োজন আদর্শনিষ্ঠ হওয়ার। পরমারাধ্য প্রভুজী বলেন, আদর্শই জীবনের পাথেয়। তাই আদর্শবিহীন জীবনযাত্রাকে তিনি মানুষের পর্যায়তেই ফেলছেন না। কারণ তাতে না মানুষের দুর্লভ জীবন যাপনের আনন্দ আছে, না, মানুষের সমাজ তার কাছ থেকে কিছু প্রত্যুপকার আশা করতে পারে। আমাদের আমি থেকে তুমির দিকে তাকানোর প্রবণতা থেকেই যে বিস্তৃতির শুরু, তারই পরিচর্যা ও সচেতনতা থেকেই আদর্শ প্রতিপালনের অঙ্গীকার আপনা হতেই কার্যকরী হয়ে যায়।

তবে কি না আদর্শের মহত্ত্ব তার ব্যাপ্তির মধ্যেই নিহিত। কেউ নিজেকে উৎসর্গ করেন জাতির কল্যাণে, তো কেউ ভাবেন সমগ্র দেশের জন্য। আবার কদাচিৎ কেউ কেউ ভাবেন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তাদের সেই ভাবনা কালের সীমাকেও লঙ্ঘন করে যায়। দেশকালের সীমারেখাকে অতিক্রম করে যায় বলেই তাদেরই প্রেরণা পৃথিবীর মানুষকে যুগ যুগ ধরে জীবনযাপনের মার্গ দেখিয়ে দেয়। তাঁরই ভাবনায় তাঁরই চেতনায় তাঁরই নির্দেশিত পথে তাঁকে মনেপ্রাণে নির্ভর করে জীবনধারণ করেই বর্তে যায় মানুষ। এই বিশ্বজনীন আদর্শই মহাপ্রাণেরা সমগ্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেন। আসলে যে আদর্শ সমগ্র বিশ্বের মানুষের প্রয়োজন সেই আদর্শকে আবিষ্কারই বিশ্বজনীন আদর্শ। এই সার্বভৌম চেতনার জাগরণ হতেই হবে। পৃথিবীব্যাপী যে অস্থিরতার সংকট আজ সমাজে সংসার এমনকি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষাতেও তৈরি হয়েছে তাকে মোকাবিলা করতে হবে। একমাত্র বিশ্বজনীন আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষই। অথচ সেই বিশ্বমুখীনতা, বিশ্বজনীনতা কী তা তো আমাদের জানতেই হবে। আদর্শ যেখানে জীবনের প্রেরণা। সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ ভুলে যায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদের সংকীর্ণতা। তাকে জানতেই হবে। কারণ এই জানার মধ্যেই আছে হওয়ার আশ্বাস। মানুষ যা চায় তাও যেমন তাকে জানতে হবে তেমনই কীভাবে তা পেতে হবে তাও তাকে জানতে হবে। আর অবশ্যই যে চাওয়ার তীব্রতাতেই পাওয়ার নিশ্চিন্ততা থাকে। যে চায় সে পায়। কিন্তু সবচেয়ে গোলমেলে এই মানুষের এই চাওয়া। একে তো বোঝে না তার জীবন ঠিক কোনো চাওয়াতে পরিতৃপ্তি লাভ করবে আবার জানে না তাকে বাস্তবায়িত করবে কীভাবে? তাই আদর্শে সম্পদশালী হয়ে ওঠার মধ্যেই জীবনের আদর্শ বেছে নেওয়া দরকার। এই আদর্শকে সমস্ত জীবনব্যাপী জারি রাখাই আদর্শনিষ্ঠ প্রাণের আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। আদর্শ তার গুরুত্ব ব্যাপকতার মধ্যেই ধার্য করে। সেই ব্যাপ্তি যেমন শুধু বহু জীবনকেই ছুঁয়ে যায় না কালের সীমাকেও অনন্ত করে দেয়। অনন্তের অভিসারী জীবন তাই অনন্ত সম্ভারের রূপকার পরমাদর্শের প্রতি জানায় তার অনন্ত শ্রদ্ধা।

❑ *সাগ্নিকা*

সম্পাদকীয়

রথযাত্রা

সুবিশাল মন্দির চত্বরে দেবতার আবাস। অসংখ্য মানুষ তাই বিশ্বাস করে। আর সেজন্যই দূরদূরান্ত হতে আসে দেবতার দর্শনের আশায়। অনেক সাধ্য সাধনা করে পাণ্ডা বা পুরোহিতদের দৌরাত্ম্য এড়িয়ে তবে কি না তাঁর চৌকাঠে মাথা ঠেকানোর সুযোগ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় মুহূর্তের দর্শন। ঝাঁপি দর্শন। ঈশ্বর যে এমনভাবেই দেখা দেন। তারপরই অবিশ্রান্ত জনতার স্রোত আপনা হতেই তাকে ঠেলে বের করে দেয় মন্দিরের বাইরে। তাই তো দেবদর্শন দুর্লভ। ফলে যেখানে দেবতার দর্শন পাওয়াই দুর্লভ সেখানে রথযাত্রার মাহাত্ম্য তো সাংঘাতিক। দেবতা সেখানে তাঁর দেবদেউল ছেড়ে নেমে আসছেন সহস্র মানুষকে দর্শন দিয়ে কৃপা করতে। তিনি রথে এসে বসছেন। তারপর তাদেরই রশির টানে পথের দুধারে থাকা অসংখ্য মানুষকে স্বয়ং দর্শন দান করতে করতে চলেন তার গন্তব্যের দিকে। অবশ্য সে গন্তব্য নেহাতই মামুলি। আসল কথা হল নিজে এগিয়ে আসছেন ভক্তের পাশে। এতদিন ভক্তরা গেছে তাঁর কাছে আর এই রথযাত্রাকে উপলক্ষ্য করে তিনি নেমে আসছেন তাঁদের মাঝে। ভক্তকুলের কাছে এ এক অপার্থিব আনন্দের যোগ। মন্দিরে তাঁর আনুষ্ঠানিক দর্শন আর আপ্লুত হয়ে ভক্তরা তাঁর বাহন সেই রথের দড়ির ছোঁওয়া পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এগিয়ে যাওয়া রথের ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে প্রকাশ করে আনন্দের আবেগ। ভক্ত আর ভগবানের যে অভেদ সম্পর্ক। ভক্ত যেমন ভগবানকে না দেখে থাকতে পারে না তেমনই ভক্তকেও দেখতে চান ভগবান। ভক্তের মনের আকুলতা আর ভক্তির মাধুর্যেই না তিনি তার সঙ্গে অভেদ হয়ে উঠেছেন। সেই অভেদাত্মক অনুভূতিতেই ধরা পড়ে যায় সৃষ্টির রহস্য। তিনিই কামনা করলেন, তাই এক হতে বহু হলেন। বহুর মধ্যেই সুতীব্র হবে এক হয়ে যাওয়ার আনন্দধারা। আনন্দই তো জগৎসঞ্চালিকা শক্তি। তাই কখনও তাঁকে দেখতে যাওয়ার কষ্ট করেও আনন্দ, কখনও দুয়ার প্রান্তে তাঁর উপস্থিতিতে উদ্বেল হওয়ার আনন্দ। সবাই তো আর ঈশ্বরকে দেখতে যেতে পারে না। দেবমন্দিরে যায় ক'জন। যারা চায় তারা যায়। আবার তাঁকে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই বা ক'জনের হয়? তাঁর দুরত্যয় মায়ার খেলায় সবাই যে জন্ম থেকেই মশগুল। কেউ কেউ সেই মায়ার খেলা খেলার ছলেই এগিয়ে যায় দেবদেউলের দিকে। কেউ চায় দেবতার দর্শন তো কেউ চায় দেবদর্শনের নজরানা দিয়ে কিছু ফলপ্রসূ আশীষে সুখের ভাণ্ডার পূর্ণ করে নিতে। শ্রীমদ্ভাগবৎগীতায় ভগবান নিজেই বলছেন, তাঁর চার রকম ভক্ত। আর্ত, অর্থার্থি, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী। কিন্তু বিচিত্র এই জগৎ সংসারে অসংখ্য মানুষের বাস যাদের ঈশ্বরের প্রতি কোনো অভীপ্সাই গড়ে ওঠেনি। তাই দেবদর্শনে যাওয়ার অভিলাষও হয়নি। এমনইভাবে অগণিত মানুষ সংসারের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের এই ব্যর্থ জীবনের গান যে ঈশ্বরের হৃদয়কেও নাড়া দিয়ে যায়। জীবমাত্রেই যে শিব। তাতে জীবের চৈতন্য থাক বা না থাক। তাই তাঁর কাছে যে পৌঁছেছে তিনি তো তাঁকে স্নেহ করছেনই, আবার যে বিভ্রান্তির ঘোরেই রয়ে গেল তাঁর জন্যও যে তাঁর বুকভরা অনুকম্পা। তাই সকলের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা। আর তাঁর কৃপাতেই না চৈতন্যের প্রকাশ। যার হয়েছে তারও মধ্যে কৃপার প্রতিফলন যার হয়নি তাঁরও সেই কৃপাতেই হবে। চৈতন্য হলেই জীবনোদ্ধারের পথ যে আপনিই কাটবে। ভগবান যে সবার। দিন হয়েছে মানেই মেঘের আড়ালে সূর্যদেব যে আছেনই। যেন অপসারণ করতে পারলেই হল। আর তার ব্যর্থতার দুঃখে একমাত্র দুঃখিত ঈশ্বর। একজন হলেও দুঃখ। তাই তো দেবদেউলের সীমানা ভেঙে তাঁর এই রথযাত্রার পরিকল্পনা, তিনি নিজেই আপামর জনজীবনের মাঝে এসে আলো ছড়াবেন। হয়তো সে আলোয় ত্বরান্বিত হবে বহু প্রাণের উন্মেষ। ঘুম ভাঙলেই সে যাত্রা করবেই। ভগবান যে নিত্য প্রতীক্ষা করেন তাঁর ভক্তের জন্য।

ধর্মের প্রেক্ষাপটে

আজও চলছে দেহসুখের ধর্মবিলাস

ধর্মচর্চার বাহুল্য আজ ঘরে ঘরে। মানুষ যে ধর্মের কথা নতুন শুনছে তা নয়, কারণ ধর্মের আস্থা ভিক্ষা না করে যে বাহ্য জগতেও চলতে পারা যাবে না সে বিষয়ে মানুষ নিশ্চিত। তাই পূজাআচ্ছা বিরত হয়নি, যাগযজ্ঞের কমতি পড়েনি, পাঠ বক্তৃতার আড়ম্বরতাও হ্রাস পায়নি। আসলে মানুষের চাহিদা আছে বলেই না তার প্রচলনও চলে আসছে। মানুষ কি চাইছে তাকে বুঝে নেওয়াই আসল কথা। আর এই সমীক্ষায় যদি দেখা যায় যে মানুষ কেবল ভোগের জীবনেরই আশ্বাস চাইছে তাহলে ধর্মের নামে ধর্মব্যবসার নানান শাখা প্রশাখার বিস্তার খুব সহজেই হতে থাকে। আর তা হয় ধর্মের নামেই, কারণ ধর্ম ছাড়া মানুষী ক্ষমতাকে অতিক্রম তো করার উপায় নেই। অতিজাগতিক শক্তির আরাধনা ছাড়া অতিরিক্ত ক্ষমতা আসবে কোথা থেকে? তাই অতিজাগতিকের সঙ্গে মিশে যায় ঈশ্বরের নাম, মিশে যায় সাধন ভজন আরাধনার নানান রহস্যময় কৌশল আর তাবিজ কবচ গ্রহ রত্নের সম্ভারে ভরে ওঠে ধর্মের ঝোলা। অথচ ধর্মের নামমাত্রকে সম্বল করে এ এক ধর্মের অপপ্রচার। মানুষ তার ভোগবাদী সুখের আশ্বাসকে বৃদ্ধির নামে আশ্রয় নিচ্ছে ধর্মের। আর তার জন্য প্রণামি মূল্যে পূজাপার্বন চলছে রমরমিয়ে। ভগবান সেখানে মানুষের চাহিদার যোগানদার। মানুষ তার হিসেব মতো ধর্ম করছে। কখনও চাহিদা জানাচ্ছে, আবার কখনও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। ঘরেরই মাঝে আজ যা চাই তা যেন পাই-এর সকরুণ আর্তি। ধর্ম এখানই নিদেনপক্ষে এক কুহেলী হয়ে যায়। একদল মানুষ ধর্মকে অবলম্বন করে ঘরসংসার ছেড়ে গিরিগুহায় সাধনা করতে আগ্রহী হয় তো আরেকদল মানুষ ধর্মকে ধরেই চাইছে ভোগবিলাসকে নিশ্চিন্ত করতে। ভোগের উপকরণও চাই, আবার শারীরিক সুস্থতাও চাই। সমাজে একদল ধর্মবিদ ধর্মের নামে এই আশ্বাস দিচ্ছে আর আরেকদল সেই আশ্বাসকে আঁচলে বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভোগের সমুদ্রে। ফলে যারা আশ্বাস নিচ্ছে আর দিচ্ছে উভয়ই পোষণ করছে ভোগবাদকে। তাই আদর্শ, ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্যার নামে আছে প্রচ্ছন্ন প্রহসন। পোষাক বদলে ধর্মীয় উপদেশ দিয়েই গ্রাসাচ্ছাদন করা মানুষের সংখ্যা কম হচ্ছে না। জীবনযাত্রা যেমনই থাক ধর্মীয় বুলি আওড়ে সত্যের সেবকরূপে নিজেকে প্রচারের আলোতে তুলে নিয়ে আসার কৌশল রপ্ত করার মধ্যেই সাধনার সিদ্ধি। আর ফল অসংখ্য ভক্ত। বিস্তর ধন সম্পত্তি জোগাড় করে দেশে-বিদেশে শাখাপ্রশাখার লম্বা লিস্ট তৈরি করে ফেলা। বলতে পারা যায় এখান থেকেই তৈরি হয় দুর্বলদের দুর্বলতার সুযোগে ধর্মরক্ষকের বেশে ধর্মের মুনাফা লেনদেন। এখানেই আজকের ধর্ম পড়ে আছে দেহসুখের কুজ্ঝটিকায়। কারণ মানুষের চেতনা উন্মেষকারী রূপের ধর্মের মহিমা আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতার ধারক রূপেই আমাদের কাছে পরিচিত। মানুষের মানবিকতা তার ত্যাগ তিতিক্ষার অধ্যবসায়ের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। অথচ ধর্মকে নিয়ে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের রমরমার এই ব্যবসায় বৈরাগ্যনিষ্ঠ ধর্মের আভূষণ কোথায়? এখানে বিলাসই ধর্মের ধারক হয়ে আছে। আসলে ধর্মের ব্যবহারেই ধর্মের পরিচয় তৈরি হয়েছে। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসার ছক তৈরি করে তারাই ধর্মকে সমাজের চাহিদা পূরণের যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ধর্মের বিকৃত উপস্থাপনায় মানব সভ্যতা বিভ্রান্ত হচ্ছে। ধর্মের শাশ্বত রূপ ঊর্ধ্বগামী চেতনায় নিহিত। যা দেহকে অতিক্রম করে যায়। লোভ, লালসার পরিবর্ধন না করে সংবরণ করতে শেখায়। কারণ সংবরণ হতেই শান্তি। নতুবা লোভ আর বিলাস তো ক্রোধ, বিপর্যয় আর ধ্বংসের রূপ। তাই তা কোনোদিন ধর্মের যথার্থ রূপ হতে পারে না। সৃজনমুখী ধর্ম সৃষ্টির খাতিরেই একমাত্র ধ্বংসকে মেনে নেয়। তাই ধ্বংসমুখী এই ধর্ম প্রতিপালন সমাজকে কোনোদিনই সত্যের পথে উদ্দীপ্ত করতে পারবে না। ধর্মীয় জগতের এই বিভ্রান্তিতে পড়ে মানুষ কখনও অতিরিক্ত সচেতন হয়ে মনে করছে ধর্মই এর জন্য দায়ী, তাই সভ্যতাকে আসন্ন ধ্বংসের ঘাত হতে বাঁচাতে ধর্মকেই পরিহার করা উচিত। তারা সামিল হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদে। ভাবছে ধর্মীয় সংঘাত, মৌলবাদীতা ধর্মেরই রূপ। ধর্মকে জীবন হতে দূরে সরিয়ে রাখলেই অনাবশ্যক ধর্মের দৌরাত্ম্যিকেও পরিহার করা হবে। অথচ সত্যিই কি ধর্ম থেকে দূরে থাকা সম্ভব? না, ধর্ম থেকে দূরে গেলে যে এগিয়ে যাওয়া হয় পশুত্বের দিকে। সভ্যতাকে বাঁচাতে গেলে যেমন নৈতিকতাকে বাঁচাতে হবে তেমনই নৈতিকতাকে বাঁচাতে গেলে ধর্মকেও পালন করতে হবে বিশুদ্ধভাবে। জীবনের এই অত্যাবশ্যক পরিচয়কে জানতে হবে, বুঝতে হবে আর তার সঙ্গে দেহবোধের কালিমা হতে রক্ষা করতে হবে। ধর্মকে যথার্থ পালনই হবে ধর্মকে রক্ষার আয়োজন। আর ধর্মকে রক্ষা করলেই ধর্মও আমাদের রক্ষা করবে। ব্যবহারের নগ্নতায় ধর্ম বিকৃত হয় মাত্র। কিন্তু ধর্ম ছাড়া মানুষের জীবনে পরম সার্থকতার আর কোনো উপায়ই নেই। তাই দেহবিলাসের মাঝে নয়, ঊর্ধ্বগামী চেতনার অনুশীলনেই ধর্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নারী চেতনা

সতীদাহ, রামমোহন ও আজকের আমরা

সূর্যতপা ব্যানার্জী

দক্ষরাজকন্যা সতী পিতার মুখে তার স্বামী বিশ্বেশ্বর মহাদেবের অপমান সইতে না পেরে পিতার কথার প্রতিবাদ জানিয়ে তার সামনেই যজ্ঞের আগুনে দেহত্যাগ করেছিলেন। এমনই ছিল সতীর কথা। স্বামী- সর্বস্ব জীবনে নারীর কাছে স্বামীর অপমানের প্রতিবাদ ছিল মৃত্যুবরণ। কিন্তু এ হেন পৌরাণিক আখ্যানকে অবলম্বন করে হিন্দুশাস্ত্রে নারীদের সহমরণে যাত্রার নাম ছিল সতীদাহ। মহাভারতের আমলে যা স্বেচ্ছা-প্রক্রিয়া ছিল, কালের জটিলতায় তা একদিন হয়ে উঠল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বীভৎস লালসার প্রকাশ। স্বামীর মৃত্যুতে অসহায় স্ত্রীকে প্রকাশ্যে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করে মৃত্যুকে বরণ করানোর মধ্যেই তাকে জীবনের সমস্ত সার্থকতার পথ দেখানো হত। এর এমনই মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছিল যে একে অস্বীকার করাতে নারী সামাজিক বিদ্রূপের ভয় পেত যেমন, তেমনই আরেকদিকে মরেও নাম পাওয়ার মিথকে আশ্রয় করে অতি সংকীর্ণ ও ক্ষতিকর মানসিক অবস্থানের পরিচয় দিত। সারা ভারতজুড়েই নারীদের মধ্যে এ ধরনের একটা আবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে সমাজের পুরুষেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রক্রিয়াটি বেশ সহজ করে নিয়েছিল। ধর্মীয় ধারণার প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করে এক প্রচ্ছন্ন নৃশংসতা বাংলা তথা ভারতের সমাজজীবনে স্থায়ী হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, অশিক্ষিত নারীরা টুঁ শব্দটি করবার জো পায়নি। মেরদণ্ডহীন প্রাণীদের কাছে যেমন সোজা হয়ে দাঁড়ানো কোনোদিনই সম্ভব নয়, তেমনই দিনের পর দিন ঘটে চলা অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নারী তুলতে পারেনি। তবে কি না এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক নৈতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত। শুভাশুভের ক্রিয়া যেমন থাকবেই, তেমনই কালের আবর্তনে যা ন্যায্য তা উঠে আসবেই। আর তা যে কীভাবে কাকে দিয়ে হবে তা কেউ জানে না। তাই অমানুষিক বর্বরতাকে যেখানে তাবড় ভারতবাসী ধর্ম বলে মনে করে মাথা গুঁজে বসেছিল, সেখানে রাজা রামমোহন রায় কঠিন লড়াই শুরু করলেন। সুবিচারের আশায় দেশ-জাতি ত্যাগ করে সুদূর লণ্ডনে পাড়ি দিয়ে সেখানকার পার্লামেন্টে এই প্রথা বন্ধের আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য করলেন। শেষ পর্যন্ত বিদেশ বিভুইয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সমাজ-সংস্কারক রূপে চিরবরণীয় হয়ে গেলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা আর সেই শুভত্বের ধারণা ধীরে ধীরে সমাজব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ তুলেছিল বৈকি। শুভ চিন্তার মৃত্যু হয় না। একদিন না একদিন তা প্রকাশ পাবেই। বাংলার নারীরা এখানেই প্রথম একটা সহায়তা পেয়েছিল সমাজের কাছ থেকে। চিরকাল অরক্ষণীয়া বলে তাকে সংরক্ষণ করতে গিয়ে একের পর এক ক্ষতিকারক প্রক্রিয়ায় সমাজ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে সবদিক দিয়েই বেঁধে রেখেছিল। তার শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, বালিকাবেলার সারল্য কেড়ে নিয়েছে গৌরীদান আর নাবালিকার বিবাহে, বহুবিবাহ আর কুলীন প্রথা তার নারীত্বকে অপমান করেছে। গঙ্গাসাগরে কন্যাসন্তান বিসর্জন তার মাতৃত্বকে আঘাত দিয়েছে। আর সব শেষে জঘন্য সতীদাহ প্রথার পোষণ করে তার বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে। অন্দরমহলের সীমাবদ্ধতায় পারিবারিক খুনসুটি আর দেহজ আবিলতায় তার মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া পরমার্থবোধ শুধু হাহাকার করে বেড়িয়েছে। কোথায় কখনও স্বাভাবিকতাকে ভেঙে প্রকৃতির নিয়মকে অব্যর্থ প্রমাণ করেছে বলেই জন্মেছে আত্মবিপ্লবী মীরাবাঈ তো কোথাও রণরঙ্গিণী লক্ষ্মীবাঈ। ভিসুভিয়াসের মতো তারা যে সমাজের সমস্ত ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে তাদের জীবনালেখ্য নিজেরাই লিখে গেছে।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মবার্ষিকী। জড় সমাজের বুকে একটা জীবনের আওয়াজ তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়ে বাঁচার ঝর্ণাধারাকে আনবার জন্য কঠোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর তাঁর সেই ইচ্ছাশক্তিতেই সমাজের বহুকালের জগদ্দল পাথর নড়ে উঠেছিল। একে একে নারীশক্তির পুনরুত্থান ঘটতে থাকে। শিক্ষার সংস্কার, সামাজিক রীতির সংস্কার, নারীপুরুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমানাধিকারের স্বীকৃতি ধীরে ধীরে সামাজিক বাতাবরণকে শোনাতে থাকে পরিবর্তনের গান।

আর এই পরিবর্তনের এলোমেলো হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে পেরিয়ে গেছে প্রায় দুশো বছর। সমাজের জীবনচিত্রও আমূল পাল্টে গেল। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ হতেই যার আভাস উঠেছিল, স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে প্রযুক্তি উন্নয়নের জেরে কিছু দশকের মধ্যেই লাগল বিশ্বায়নের ধারা। গণমাধ্যমের বিপুল প্রসারে অনুকরণপ্রিয়তার হাওয়ায় বাহ্যিক আড়ম্বরের পার্থক্য নেই প্রত্যন্ত পল্লীর বালিকা আর পাশ্চাত্যের নাবালিকার। সামাজিক ধারাও ভাঙনের মুখে। সংস্কৃতি ও কৃষ্টির জাতিগত সংরক্ষণের জন্য চলছে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস,কারণ ভাঙন যখন এসেছে তখন তা ভালো আর মন্দের নির্বাচন করবে না। জাতি, ব্যক্তি, দেশের ঐতিহ্য সমস্ত কিছু হারিয়ে কোথায় যেন কোনো বিপ্লবের তোড়জোড় চলছে। আর এভাবে চলতে চলতে আমাদের রীতি, নৈতিকতা আর মূল্যবোধকেও যখন তা ছুঁয়ে ফেলছে তখনই আবার ঘূর্ণাবর্তের কালো মেঘ কিন্তু ঘনিয়ে আসতে থাকে সকলের অগোচরেই। কারণ জড়তার গ্লানি যেমন ক্ষতিকারক তেমনই ভয়ংকর উচ্ছৃঙ্খলতা আর উদ্দামতা। একটা তুঁষের আগুন, আরেকটা যেন লেলিহান শিখা।

তাই যে ভাঙন রামমোহন জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন আজ তার বিপরীত পীঠে আমরা দাঁড়িয়ে। সেদিনও প্রকৃতিই সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল আর আজও সেই প্রকৃতিই তার চরম সংকটের মোকাবিলার জন্য আয়োজন করে চলেছে। তাই এ পৃথিবীর কোনো এক প্রান্ত হতে নীরব যোগীর নিভৃত সাধনগম্ভীরা হতে উত্থিত হচ্ছে বার্তা 'নারীমুক্তি এ যুগের সঞ্জীবনী মন্ত্র'। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, বৈরাগ্যের একনিষ্ঠ সাধনায় নতুন দিনের সূর্য যে প্রকাশ-উন্মুখ। শুধু যোগী বলছেন, ''যার চোখ আছে সে দেখুক, যার কান আছে সে শুনুক।''

'আমি ধার্মিক লোকেদের জন্য নই, কিন্তু মন্দ লোকের মন পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীতে এসেছি। যারা অসহায়, দুর্বল, যারা প্রভুকে নির্ভর করেছে— আমি তাদেরই সেবক, তাদেরই সখা।' —শ্রীশ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত
মীনাক্ষী ঘোষ
স্টিল টাউনশিপ, দুর্গাপুর

'জগৎপাত্রে কিছু রেখে যাও। জগৎকে তোমার অনেক কিছু দেবার আছে। নিজেকে দুর্বল, অসহায় ভেবে মোহগ্রস্ত হবে না। তত্ত্বমসি। জানাতে চেষ্টা করো তোমার কর্মের উৎসস্থল। —শ্রীশ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত
মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায়
কুড়মুন, বর্ধমান

'উৎসর্পী' প্রকাশিত হয় প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে। 'উৎসর্পী'র জন্য অরাজনৈতিক মৌলিক চিন্তাশীল সংক্ষিপ্ত রচনা যে কেউ পাঠাতে পারেন। লেখা পাঠান আমাদের দপ্তরের ঠিকানায়। শময়িতা মঠ প্রকাশিত সমস্ত পত্রপত্রিকা, বই, সিডি ও ডিভিডি-র প্রাপ্তিস্থান :

(১) শময়িতা মঠ কার্যালয়, রণবহাল, অমরকানন, বাঁকুড়া
(২) শময়িতা মঠ দুর্গাপুর শাখা ৪/৩৪ সরোজিনী নাইডু পথ, নন কোম্পানি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-১৬
(৩) কলকাতা, কলেজস্ট্রিট : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু. দক্ষিণ কলকাতা : শিবনাথ ভবন, ফ্ল্যাট X2, 1st floor, ঢাকুরিয়া ব্রিজ (পবিত্র ঘোষ)। সল্টলেক : করুণাময়ী আবাসন, ফ্ল্যাট F30/5 (অঞ্জলি মুখার্জি)। শময়িতা মঠ কলকাতা কার্যালয়, মনসা অ্যাপার্টমেন্ট, মনসা মন্দির, লেকটাউন
(৪) শময়িতা স্রোতস্বিনী, কদমকানন, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর

রূপের আড়ালে অরূপ

প্রতিমা সাহু

আমাদের এই গতিময় জীবনে যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে তেমনি ভারতীয় রেলে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সি.এল.ডব্লু. যেন প্রতিদিন নতুন প্রাণসঞ্চার করে যাচ্ছে। এই সি.এল.ডব্লু. কী বা তার গুরুত্ব কোথায় তা ভালোভাবে জানার কথা কেউই প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্যের কথা জানতে গেলে এই ছোট্ট শিল্পকেন্দ্রিক কথা আমাদের জানা উচিত।

এশিয়ার বৃহত্তম রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কাস (সি.এল.ডব্লু.)। কারখানাকেন্দ্রিক সংরক্ষিত শহর চিত্তরঞ্জন। প্রায় আঠারো বর্গ কিলোমিটার এরিয়া বেষ্টিত শহরে দশ হাজার কর্মী আবাসন, আধিকারিক বাংলোগুলিও গাছপালা বেষ্টিত। ফলফুল পাতাবাহারের মনমোহিনী আকর্ষণে বড়ো বড়ো জলাশয়গুলিতে শীতকালীন পরিযায়ী পাখিদের আগমন প্রকৃতির বুকে নতুন ছবি এঁকে দিয়ে যায়। এছাড়া সৌন্দর্য রক্ষার প্রয়াসে বছরে 'সেরাবাগান'-এর প্রতিযোগিতা শহরবাসীর কাছে অন্য উদ্যম ও আনন্দ এনে দেয়। টিলা-টিব্বা-ঝিল পাহাড়ি, সুন্দর পাহাড়ি, হিলটপ, কানগোই পাহাড় শহরের মধ্যে ও চতুর্দিকে যেমন ছড়িয়ে আছে, সেইরকমই অজয়ের ধারায় ধুয়ে মুছে সাফ হচ্ছে অনেক কিছুই। শীতকালে অজয় নদের ধারে হনুমান মন্দিরে বনভোজনে মেতে ওঠে শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা। পরিবেশের টানে অনেকে চলে আসেন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেও।

এ তো গেল প্রাকৃতিক পরিবেশের সংক্ষিপ্ত কিছু কথা। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় ১৯৫০ সাল থেকেই শুরু করে ডিজেল হয়ে বর্তমানের অত্যাধুনিক থ্রিফেজ ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে, যার দ্বারা রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্তসহ লোকাল, এক্সপ্রেস, সুপার ফাস্ট ইঞ্জিনগুলি পর্যন্ত পরিবহনে সর্বদা ব্যস্ত। খুব অল্প সময়ে যেতে পারছি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এইসব ইঞ্জিনের দক্ষ পরিচালকদের সাহায্যে। তাই তো ভারতীয় রেলকে বলা হয় ভারতের 'নার্ভসিস্টেম' এবং এই নার্ভকে সঞ্চালনা করছে যে মাথা অর্থাৎ রেলইঞ্জিন তা অবশ্যই সি.এল.ডব্লু.র কৃতিত্ব। কলকারখানার শহরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষগুলিও নানারকম সাংস্কৃতিক কাজে লিপ্ত। এখানে গান-কবিতা-নাচ-নাটক-যাত্রা কোনো কিছুরই কমতি নেই। বাসন্তী ও শ্রীলতা ইনস্টিটিউট, শরৎ ইনস্টিটিউট, সুর ও বাণী, সুরঞ্জনা, সুর সাধনা, কলামণ্ডলের মতো সংস্থাগুলি সর্বদা রবীন্দ্রমঞ্চে রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, সুকান্ত জয়ন্তী সহ নানারকম সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে, যা শুধু চিত্তরঞ্জন শহরে সীমাবদ্ধ না থেকে আশেপাশের স্থানে, এমনকি সারা ভারতেও সংস্কৃতির সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শ্রীলতা ময়দান, ওভাল ময়দানে চলে ফুটবল এবং ক্রিকেটের প্রতিনিয়ত অভ্যাস। ইনডোর স্টেডিয়ামে কত ছেলেমেয়ে খেলে ব্যাটমিন্টন ও টেবিল টেনিস। এছাড়া দুটি সুইমিংপুল ও দুটি লাইব্রেরিও শহরে অবস্থিত। এ সবই এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ব্যাপার! সবচেয়ে মজার হল এই শহর একটি ছোট্ট ভারতবর্ষ— কেননা যেহেতু ভারত সরকারের সংস্থা, সেহেতু এখানে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশ থেকে মানুষের আগমন ঘটে এবং তাঁরাও নিজেদের মতো তাঁদের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করেন। উড়িষ্যার জগন্নাথের মন্দিরের আদলে মন্দির আছে। রথযাত্রার উৎসব হয় সমারোহে। বড়োদিন, গুরু নানকের জন্মদিন, মহরম, পোঙ্গল উৎসবগুলিও পালিত হয়। আবার সকলে মিলে শহরের আটটি এরিয়ায় মিলিত হয় শারদীয়ার উৎসবগুলিতেও।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে বলতে হয় এক কথায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। আটটি এরিয়া হাসপাতালের পাশে একটি প্রধান বা সেন্ট্রাল হাসপাতাল প্রতিদিন প্রতিনিয়ত শহরবাসীর সেবায় লিপ্ত থাকেন। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি মিলে বেশকিছু স্কুলে যোগ্য উচ্চমানের শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রদানে ব্যস্ত থাকেন। এখানে অনেক মিশনের প্রাক্তন ছাত্রও ডাক্তার বা শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন।

এই সবই তো হল শহরকেন্দ্রিক। কিন্তু প্রতিদিন এখনও এখানে কান পাতলে শোনা যায় সেই মাদলের বোল— যা কারখানার পত্তনের আগে শোনা যেত। আজকের চারদিকে দেওয়াল বেষ্টিত গোছানো শহর একদিন ছিল আদিবাসীদের নিজস্ব বাসভূমি, সেখানে তারা সরল মনে সহজভাবে কাজকর্ম করত। উচ্ছেদ মেনে নিলেও স্বীকৃতি স্বরূপ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের গায়ে আঁকা ছিল তীর ধনুকের সুন্দর এ্যাম্বলেম্ব যা আজও সেই স্মৃতিকে বহন করে চলেছে। যেমন বয়ে চলেছে শহরের উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলির আদিম সংস্কৃতি।

বাদনা-শহরায় সহ নানা উৎসবে মাদলের বোলে আমাদের কত কথাই এখনও বলতে ইচ্ছে হয়—খুঁজতে থাকি রূপের মাঝে সেই সমস্ত অরূপকে।

মঠ সংবাদ

কমিউনিয়ন হলে শাস্ত্রীয় সংগীতসন্ধ্যা

আষাঢ় সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর, যেন তীব্র দহনের পর স্বস্তির বরিষণে প্রাণের আরাম। গত ৯ আষাঢ় রবিবার (২৪ জুন) সন্ধে সাতটায় শময়িতা মঠের কমিউনিয়ন হলে শাস্ত্রীয় সংগীতের আয়োজন এলাকার সংগীতপিপাসু মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ তৈরি করেছিল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরমপ্রিয় প্রভুজীকে প্রণতি জানিয়ে বন্দনাগান পরিবেশন করেন 'মাদার' প্রজ্ঞামিতা। তাঁর চর্চিত কণ্ঠমাধুর্য এবং রাগাশ্রয়ী পরিবেশনা অনুষ্ঠানের সুর বেঁধে দেয়। শ্রীখোলে অধীর রায় এবং পার্কাসনে শ্রীহিমাদ্রি তাঁকে সুচারুভাবে সহযোগিতা করেন। এরপর প্রভুজীর স্নেহধন্য শময়িতা মঠের আদর্শ এবং মানুষের অন্তর্গত চিত্তের প্রকাশ ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেন মঠের সম্পাদক ঋষিঋদ্ধা অনাহতা। মানসিক প্রশান্তির জন্য বড়ো প্রয়োজন সংগীতের। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের পরম্পরা ও চিরকালীন আবেদনের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে তুলে ধরেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক শৈলেন চক্রবর্তী।

শময়িতা মঠের পক্ষ থেকে উপস্থিত শিল্পীদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহার দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এদিনের শিল্পীরা হলেন এই সময়ের বিশিষ্ট তরুণ বাঁশুরিয়া মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, হারমোনিয়াম বাদক সোমেন পোদ্দার, তবলিয়া কিংশুক মুখোপাধ্যায়, পাখোয়াজবাদক নিশান্ত সিং এবং বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী প্রভুজীর স্নেহের আশ্রমকন্যা মৈত্রেয়ী সিংহ।

অনুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী মৈত্রেয়ী। বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশিষ্ট সংগীতসাধক নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠ নেওয়ার পর মৈত্রেয়ী দীর্ঘদিন তালিম নেন বেনারস ঘরানার সুরসাধক ড. ঋত্বিক সান্যালের কাছে। পরে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ও বিদূষী পূর্ণিমা চৌধুরীর কাছে তাঁর নিবিড় অনুশীলন। মৈত্রেয়ীর প্রথম নিবেদন আভোগী কানাড়া রাগে খেয়াল। প্রলম্বিত আলাপের পর বিলম্বিত একতালে নিবদ্ধ ''দয়া করো প্রভু'' চরণখানি শিল্পীর কণ্ঠে ভক্তিরসের সঞ্চার করে। দ্রুত কণ্ঠের ওঠানামা এবং কণ্ঠপ্রাবল্য মৈত্রেয়ীর গায়নশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদিনও তিনি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেছেন। খেয়ালের পর তাঁর নিবেদন শ্যামবন্দনায় 'কাজরী' এবং সবশেষে ভজন 'প্রণমামি ঋষি কৃষ্ণম'। মৈত্রেয়ীর কণ্ঠের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল সোমেন পোদ্দারের হারমোনিয়াম। পিতৃদেবের কাছে সোমেনের প্রথম পাঠ। পরে পণ্ডিত সঞ্জয় চক্রবর্তীর কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের পাঠ নেন। তবলায় সংগত করেন পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র কিংশুক মুখোপাধ্যায়।

কমিউনিয়ন হলের বাইরে আষাঢ়-সন্ধ্যাও যেন তখন মুগ্ধ শ্রোতা। নিস্তব্ধ চরাচর যেন মগ্ন যোগীরাজ। পরিবেশের গাম্ভীর্য বুঝে যোগ রাগে বাঁশিতে সুর তুললেন বাঁশুরিয়া মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে আধুনিক বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্বে পণ্ডিত রবিশঙ্করজির সঙ্গে প্রায় সমভাবে উচ্চারিত হয় পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার নাম। গুরুজি পণ্ডিত চৌরাশিয়ার আশীর্বাদ পেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়। তাঁর মগ্ন পরিবেশনায় অভিভূত শ্রোতামণ্ডলী। যোগ রাগের পর পাহাড়ি ধুন এবং সবশেষে শ্রোতাদের অনুরোধে বাঁশিতে লোকজ সুর তুললেন মৃত্যুঞ্জয়। তাঁর বাঁশির সঙ্গে যুগলবন্দি হয়ে থাকল নিশান্ত সিংয়ের পাখোয়াজ এবং কিংশুকের তবলা। পণ্ডিত চঞ্চল ভট্টাচার্যের কাছে যথার্থ শিক্ষা পেয়েছেন নিশান্ত। তাঁর আঙুলের টোকা সুর তোলে তন্ত্রীতে।

ঘড়িতে তখন রাত পৌনে দশটা। মন ভরেনি। অতৃপ্তি নিয়েই সময়ের শাসনে শেষ করতে হল শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর। শেষ হল সংগীতবাসর, কিন্তু সুর থেকে গেল উপস্থিত প্রত্যেকের মনে। এমন সুরের আয়োজনে প্রকৃতিও ঋদ্ধ হয় বুঝি! সংগীতের দেবতাকে আমাদের প্রণতি।

❑ *ঝিনুক চক্রবর্তী*

গভীর বিশ্বাসই জীবনে প্রশান্তি আনে

শৈলেন চক্রবর্তী

বিশ্বাস শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'শ্বস্' ধাতু থেকে। 'শ্বস্' + অ = শ্বাস। বিশেষভাবে 'শ্বাস' হল 'বিশ্বাস'। বিশ্বাস করলে বিশেষভাবে শ্বাস নেওয়া যায়। আহ, নিশ্চিন্ততা। আরাম। আর বিশ্বাস না করলে 'শ্বাস' ওঠে, প্রাণ হাঁসফাঁস করে। বড়ো অস্থির লাগে।

নিয়ত অস্থিরতা, নাকি প্রাণের আরাম! কোন্‌টা জরুরি? মানুষের যাপিত জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে ওঠে প্রবাদ। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'—এ কি কথার কথা?

'কর্ম করতে গেলে আগে একটা বিশ্বাস চাই'—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। 'চাই বিশ্বাস বিশ্বাস আর বিশ্বাস। বিশ্বাস থাকলে সব হবে'। বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু সবার মন তো এক তারে বাঁধা নয়, তাই সবার বিশ্বাসও একরকম নয়। রকমফের আছে। কিন্তু 'বিশ্বাস' কি আছে?

প্রাচীন ভারতবর্ষে অধ্যাত্মশাস্ত্রে ঈশ্বরবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস ছাড়া এগোনো যায় না। আধুনিক চেতনাতেও বিশ্বাসের জোর কম নয়। 'বিশ্বাস কি কম গা? বিশ্বাসে কী না হয়!' বিশ্বাসই তো শক্তি, বিশ্বাস না থাকলে সংশয়ে যে কর্তব্য তোমার পদে পদে ভারাতুর হয়ে উঠবে। একথা বলছেন শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে। দেবযান-এ চমৎকার বলেছেন বিভূতিভূষণ, 'বিশ্বাস করলে তো মানুষ আর মানুষ থাকে না, ভগবান হয়ে যায়।'

বিশ্বাস-এর সঙ্গে কি যুক্তির বিরোধ আছে? বিশ্বাস এবং যুক্তির মধ্যে লড়াই নাকি সখ্য? কার জোর বেশি, বিশ্বাস না যুক্তির?

রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'যুক্তি পেয়েছি বলেই বিশ্বাস করি, সেটা অল্পক্ষেত্রেই, বিশ্বাস করি বলেই যুক্ত জুটিয়ে আনি, সেইটেই অনেক ক্ষেত্রে' (স্বরাজসাধনা)।

আমরা আমজনতা, অল্পজলের চুনোপুঁটির দল, প্রতিদিন যুক্তি দিয়ে তুড়ি মেরে বিশ্বাসকে উড়িয়ে দিচ্ছি দুবেলা। বুঝতেই পারি না, বিশ্বাস নেই বলেই আমরা অস্তিত্বহীন। আধুনিক সময়ের বলিষ্ঠ কথাকার মহাশ্বেতা দেবী বলছেন 'বাস্তু হারালে উদ্বাস্তু হয় যেমন, তেমনি কোনো কিছুতে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না থাকলে সেও উদ্বাস্তু' (বন্দোবস্তী)। বিশ্বাসই তো জীবনে ভিত তৈরি করে, 'ভূমি' দেয়। অবশ্য আমরা যে 'ভিত' বলতে বুঝি বাড়িঘর, উপার্জন, বৈভব! হা রে, সংসারের দৃষ্টি।

বিশ্বাস করার জন্য কি একটা নির্দিষ্ট বয়স লাগে? বিশ্বাস মানে কি 'ঈশ্বরবিশ্বাস'? একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর, জীবন যখন একটু 'থুত্থুরে' হয়, নিজেকে একটু 'অপারগ' মনে হয়, কেমন যেন 'আত্মহারা অসহায়' লাগে, তখনই মন নত হয়ে বলে, 'হে প্রভু, দয়া করো'। এ তো স্রেফ ধান্দাবাজি। এটা বিশ্বাস নয়। এটা তো স্বার্থ। অসহায়ের 'স্বার্থ' থাকে না বুঝি! এখন আমার কেউ নেই কিছু নেই, আমাকে উদ্ধার করো। বুড়ো বাঘ হাতে-তোলা 'বোনলেস' মাংস চায়। শরীরের দাপট কমে গেলে শিকার করা ছেড়ে দেয়। এর নাম কি অহিংসা!

'বিশ্বাস' হল জীবনের সার্বিক পরিবর্তন। বিশ্বাস হল অন্তর্দৃষ্টি। প্রভুজী বলছেন, আত্ম-আবিষ্কার। নিজেকে জানো। তুমিই সর্বশক্তির আধার। বললে তো হবে না, এই বোধে নিজেকে জারিত করতে হবে। বিশ্বাস হল আত্মজৈবনিক জারণ প্রক্রিয়া, যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সতত ক্রিয়াশীল। যখন সচেতনভাবে 'বিশ্বাস'-এর মধ্যে থাকি, তখনই আমার অস্তিত্ব। যখনই বিশ্বাসহীন হয়ে পড়ি, ভেসে যাই খড়কুটোর মতো।

বিশ্বাস ছাড়া কোনো মহৎ কর্ম হয় না। জগৎ দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ওপর। আইনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথের সেই সাক্ষাতের কথা মনে পড়ছে (১৪ জুলাই ১৯৩০, কাপুথ)। আইনস্টাইন বললেন, দুটি মতবাদের কথা। এই বিশ্ব মানুষের উপর নির্ভর এক অখণ্ড বিশ্ব। অর্থাৎ মানুষ আছে বলেই মহাবিশ্ব আছে। আমি নেই, জগৎও নেই। আমি যদি অচেতন হই, কোথায় জগৎ! আমারই চেতনার দৃষ্টিতে জগৎকে দেখছি। এই হল একটি মতবাদ।

অন্য মতবাদটি হল, মানব-নিরপেক্ষ এক বাস্তব জগৎ। মানুষ থাক বা না-থাক, জগৎ আছে আপন মহিমায়।

আইনস্টাইন বললেন, তবে আমি বিশ্বাস করি, এই দ্বিতীয় মতবাদে। অর্থাৎ মানবনিরপেক্ষ বাস্তব জগতে।

রবীন্দ্রনাথ মানতে পারলেন না। তিনি বললেন, মানুষ আছে বলেই জগৎ সুন্দর। মানুষ না থাকলে বিশ্বজগতের এই বিচিত্র সৌন্দর্যও অর্থহীন। আসলে মানুষও নয়, মানুষের অন্তর্গত চেতনা, সত্য দৃষ্টি জগৎকে সুন্দর করেছে।

মৌমাছি কি ফুলের সৌন্দর্য বোঝে? সে বোঝে মধু। ময়ূর পেখম মেললে নেকড়ে ওত পেতে থাকে। নেকড়ে বোঝে না সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানুষ আছে বলেই সত্য এবং বিশ্বাস আছে।

আবারও একমত হলেন না আইনস্টাইন। বললেন, সত্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ। মানুষ থাক বা না থাক সত্য থাকবেই। আর সত্য বিশ্বাসনির্ভরও নয়। বিশ্বাস না করলেও 'সত্য' সত্যই।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানুষ নেই, সত্যও নেই। আর বিশ্বাস না থাকলে সত্যের মূল্য কোথায়। হয়তো সত্য থাকবে, কিন্তু সত্যের উপলব্ধি থাকবে না।

এই সত্যের উপলব্ধি নির্ভর করে বিশ্বাসের ওপর। উপলব্ধি থাকলে তবেই আনন্দ। আর আনন্দই তো জীবনের গভীর প্রশান্তির প্রথম ধাপ।

যদি আনন্দ পেতে চাও, বিশ্বাস করো। যদি সত্যকে উপলব্ধি করতে চাও, বিশ্বাস করো। যদি এগোতে চাও, বিশ্বাস করো।

যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের কোনো বিরোধ নেই। প্রভুজী বলছেন, 'বাজিয়ে লাও'। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করো, কিন্তু বিশ্বাস থাকা চাই। তবে মনে রেখো, বিশ্বাস সত্যের প্রতি। বুজরুকিতে বিশ্বাস নয়, 'অন্ধবিশ্বাস'ও নয়।

১৯২৭ সালে বিজ্ঞানী নীলস বোর পরমাণুর গঠন কল্পনা করলেন। হ্যাঁ, কল্পনাই বলছি। কেননা পরমাণুকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। কিন্তু তার অস্তিত্ব বিশ্ব চরাচরজুড়ে, কণায় কণায়। পরমাণুকে অবিশ্বাস করলে কী থাকে!

আধুনিক বিজ্ঞানের সমগ্র জগৎ দাঁড়িয়ে আছে এই পরমাণুর অস্তিত্বের ওপর। কিন্তু পরমাণুর মডেল হল কল্পনা এবং গভীর বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসটুকু না থাকলে কোয়ান্টাম ফিজিক্স হাপিস। পরমাণুর গঠন নিয়ে নীলস বোরের 'বিশ্বাস' আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় গবেষণা ও 'সত্য'কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমিই হল এই 'বিশ্বাস'।

বিশ্বাসে ভর করে যে সত্যের উপলব্ধি, তাই হল মানুষের কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি। জীবনের প্রথম ভাগে কেউ এই উপলব্ধিতে পৌঁছুতে পারলে, তার জীবন সার্থক। কেউ বা সত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছুতে পারে জীবনের শেষবেলায়। কারও বা এক জীবনে সেই উপলব্ধি অধরাই থেকে যায়।

বিশ্বাস নিয়ে এত কথা মনের মধ্যে এল কেন? 'অবিশ্বাস' শব্দটি থেকে। অবিশ্বাস শব্দটি আমার মনের মধ্যে আজকাল বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। আপনার মনের মধ্যেও কি এমন হয়? কারও চূড়ান্ত অনুরাগী হওয়ার পরও কি তাঁকে অবিশ্বাস করা যায়! নাকি ভালোলাগা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা প্রেম অনুরাগ সবই দাঁড়িয়ে থাকে 'বিশ্বাস'-এর ওপর? বিশ্বাস করলেই সব পাওয়া যায়। বিশ্বাসে আনন্দ, বিশ্বাসে নির্ভরতা, বিশ্বাসে প্রশান্তি। আর জীবনে প্রশান্তি কে না চায়, বলো!

''হে অমৃতের সন্তান উঠে দাঁড়াও। হাতে নাও জ্ঞানদীপ, অসংখ্য সমস্যা-সংকুল পথ বেয়ে জাগাতে হবে 'তত্ত্বমসি'।''

—শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত

শুক্লা পাল, বোলপুর

''মানবধর্মকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই, আহ্বান জানাই বোধির চেতনায় দীপ্ত হয়ে জীবনকে বোঝার, জীবনকে সার্থক করার।''

—শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত

জনৈক ভক্ত—বেহালা, কলকাতা

আসল স্বরূপ

জ্যোৎস্না মজুমদার

ঈশ্বরকে জেনে সংসার করলে, সংসার আর আমার বলে বোধ হয় না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনের পরিবর্তন হয়ে যায়। ঈশ্বরের আনন্দরূপ ক্ষণিকের জন্য মনের মাঝে আসে কিন্তু তা চিরস্থায়ী হবে না। আমরা ভুলেই গেছি আমাদের স্বরূপ। আমরা শান্তিস্বরূপ। আমরা আনন্দ স্বরূপ। এটাই আমাদের আসল স্বরূপ। শ্রীপ্রভু বলেন—আপন, আপন সাধনাতে ডুব দাও, তবে নিজের জীবনের প্রাপ্তি এনে দেবে।

পৃথিবীতে আসা যাওয়া আর আসা যাওয়া সার। ঈশ্বরের জন্য মনপ্রাণ নিয়োগ করতে পারি না। নিজেকে জানা, চেনা কিছুই হয় না। জ্ঞান ভক্তি এই দুইকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে চলতে তাঁর প্রতি ভালোবাসা উথলে উঠে। প্রার্থনা, জ্ঞান, ভক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে সখ্য। তিনি আমাদের মাতা, পিতা, বন্ধু। সবই তিনি। তাঁকে পাওয়ার আকুতি জাগে। তুমি বিনা কেউ নেই। কখনো তিনি মাতার ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি আমাদের প্রাণে প্রাণে মিশে যান। বলেন, ওঠো জাগো, তোমার প্রাণে প্রাণে, তোমার সত্তায় সত্তায় রয়েছে আনন্দের লহরী। জীবনের লক্ষ্যে স্থিত থাক। অন্তরমুখী হও। যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখান থেকেই তদ্‌গত হয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

মনের যে বুদবুদগুলো উঠবে তা দিয়ে তাঁর শ্রীচরণে অঞ্জলি দেব। আমাদের নিত্য দিনের তপস্যা হবে তাঁর শ্রীচরণে অঞ্জলি দেওয়া। শ্রীভগবান বলেন, 'ভক্তের প্রাণে যে ইচ্ছা জাগে সে তো আমারই ইচ্ছা। যুগ যুগ ধরে আমি তো ভক্তহৃদয়ে ইচ্ছা জাগিয়ে এসেছি। ভগবানের তো কোনো ইচ্ছা নেই। ভক্তের ইচ্ছাকে রূপ দিতে আমি বদ্ধপরিকর।"

মানুষ এই পৃথিবীতে সবাই একা। বাহিরের সম্পর্কে যতই সম্পর্ক থাকুক না কেন? অন্তরে সে একা, কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। তাই ভক্ত বলে—প্রভু, আমি একা। তুমি আমাকে সঙ্গ দিও। তুমি একমাত্র আমার ভরসা। তোমার ভক্তকে তোমার সঙ্গে নিয়ে থেকো।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে পাই—

ঠাকুর বলছেন, কেউ কেউ বলে আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি মুক্তি আছে, রাজা যুধিষ্ঠির নরক দর্শন করেছিলেন। তখন আমার খুব রাগ হল। বললাম তুমি কেমন গা। যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক দর্শনই মনে করে রেখেছ?

যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না।"

হে ঈশ্বর, সব সময়ে শুধু সংসারের কথা, তোমার কথা কেউ বলে না। অন্যের দোষ আবিষ্কার করতে পারলে আর কিছুই চাই না এমন ভাব অধিকাংশ মানুষের মধ্যে।

তাই হয়তো রাজা যুধিষ্ঠিরের গুণগুলো দেখতে পাওয়া যায়নি। দোষ, আর গুণ নিয়েই মানুষ কথা বলে। দোষ বর্জন করে যদি কারো গুণ গ্রহণ করা যায়, বরং ভালো কাজ। সবার জন্যই ভালো। আপন আপন সংস্কারে জীব বদ্ধ। আমরা ভুলে যাই, তিনি অন্তরে থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। মনের রূপান্তরই হল ধর্ম। সত্য উদ্‌ঘাটন করেই সত্য উদ্‌ভাসিত হয়। আপন মৌলিকতায় থেকে জীবনকে জানতে হবে। ধর্ম হল নিশ্বাস। ঈশ্বর তাঁর প্রাণ। প্রতিনিয়ত অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে তাঁর দিকে।

আদর্শকে মনে রেখে যখন পথ চলবো, তখন সংযমের পথ তৈরি হবে। তাঁকে মনে প্রাণে গ্রহণ করব। জীবন সজীব থাকবে। আনন্দে থাকব।

অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে হবে। সেখানে নরতনু থাকুক। অনুশীলনের দ্বারা দেবতনুতে রূপান্তরিত হতে হবে। যখন নরতনু দেবতনুতে রূপান্তরিত হবে, তখন সেই দেহতে দৈবগুণের বিকাশ ঘটতে থাকবে। যখন অন্তরে বিকাশ ঘটতে থাকবে তখন তিনিই বুঝিয়ে দেবেন এবারে বাহির থেকে ভিতরে আসার সময় হয়ে গেছে তোমার। এখানেই আছে আনন্দধাম। কোনো বাধা নেই। কোনো ভেদাভেদ নেই, সকলেই আসতে পারো। শুধু আমাকে অনুসরণ করো। তিনি একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

সকলকে নিয়ে চলেছেন উৎসপানে। অন্তরদীপ জ্বালিয়ে রাখব নিত্য নিরন্তর মনন দিয়ে।

শুধু বাতি উসকে দেওয়ার দায়িত্ব স্বয়ং তাঁর। আর কোনো দিকে লক্ষ্য থাকবে না। অন্তরের চিন্তাভাবনা দিয়ে শুধু তাঁকে দেখা, তাঁকে জানা। তাঁকে ভালোবাসা।

আর তাঁর চেতনাকে অন্তরমাঝে জাগিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হবে। সন্ত হৃদয় শুধু তাঁরই জন্য, জীবনের মাঝে রূপান্তর।

ভূমি থেকে ভূমাতে আলিঙ্গন। কোনো চিন্তাভাবনা করবার দরকার নেই। আছে শুধু আনন্দ।

এখানে শরণাগতিই হল মহৌষধ। তাঁর কথাই বেদ বাক্য। কথার কথা নয় শুধু। তাঁর কথা অন্তর-দেশকে ছুঁয়ে যায়। সেই প্রভুধামে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে হবে, কখন তাঁর কৃপার বাতাস অন্তরে বয়ে যাবে। জীব একবার যদি ইচ্ছা করে তবে ঈশ্বর শতবার এগিয়ে আসেন। আমরা জেগে থাকব, কখন তাঁর ডাক আসবে?

"আমার এ ঘর বহু যতন করে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।
আমারে যে জাগতে হবে,
কী জানি যে আসবে কবে
যদি আমরা পড়ে তাহার মনে।"

বৃষ্টির দিন এবং বুড়িমা

দেবদত্তা চক্রবর্তী *চতুর্থ শ্রেণি, শময়িতা কনভেন্ট স্কুল*

এক বাড়িতে এক ভাই আর এক দিদি থাকত। ওদের মা-বাবা দুজনেই ছোটোবেলায় মারা গেছেন। তাই ওদেরকে পাড়ার এক বুড়িমা মানুষ করেছেন। খুব কষ্টে। তিনিই ওদের নাম দিয়েছিলেন। মেয়েটার নাম নূপুর আর ছেলেটার নাম সৌভিক। নূপুর ক্লাস ফাইভে পড়ে আর সৌভিক ক্লাস ফোরে। সেই সময় ওই বুড়িমাও চোখ বুজলেন আর ওদের মনে খুব কষ্ট হল। সবে নূপুর ক্লাস ফাইভে, কী আর করবে! তখন ও আস্তে আস্তে অনেক কাজ করতে শিখল, অনেক বড়ো হতে লাগল। ওর ভাইও বড়ো হল। দিদি আর ভাই পড়াশুনা করে, বাড়ির সামনে সবজি চাষ করে। সবজি বিক্রি করে। পেঁপে, সজনে শাক, বাতাবি লেবু এইসব। তখন ওদের আর কোনোরকম কষ্ট হয় না। দুঃখও করে না, খুব হাসিখুশিতে থাকে। খুব মজা করে। পাড়ার সবাই তাদের ভালোবাসে।

আষাঢ় মাস। একদিন ঝমঝম করে খুব বৃষ্টি আরম্ভ হল। সন্ধে পেরিয়ে রাত। ওরা ঘরে পড়তে বসেছে। হঠাৎ লোডশেডিং। ওরা আর কী করে, গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর একবার উঠোনে দরজার কাছে ডাক পড়ল। কেউ কি আছ ঘরে? ডাকাডাকিতে নূপুরের ঘুম ভেঙে গেল। দরজার কাছে এসে পর দেখে একটা থুত্থুরে বুড়িমা। ও বলল—এত বৃষ্টিতে এখানে কী করছ? বাড়ি যাওনি?

বুড়িমা বলল—দিদিভাই, বাজার থেকে আসছিলাম তখন হঠাৎ করে বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমি তো জানতাম না বৃষ্টি হবে তাই ছাতাটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছি। আমাকে একটু আশ্রয় দেবে?

নূপুর বলল—নিশ্চয়ই দেব। দেব না কেন? এসো এসো।

তারপর ওরা ঘরে এল। বুড়িমাকে অন্য একটা শাড়ি দিল। বুড়িমা ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরল। তারপর অনেক গল্প করল। কিছুক্ষণ পর সৌভিক উঠল। বুড়িমাকে দেখে সে তো অবাক। বলল—দিদি আমাকে এতক্ষণ জাগাসনি কেন? তুই কত গল্প করলি। কত গল্প শুনলি। খুব বদমাস তুই।

তখন বুড়িমা বললেন, আরে আরে এ কী করছ? ঝগড়া করতে নেই। তারপর ওরা তিনজনে একসঙ্গে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরবেলা উঠে নূপুর দেখল যে বুড়িমা নেই। ঘরের কোণে দড়িতে ঝুলছে সেই শাড়িটা। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সৌভিকও উঠে দেখল, বালিশের পাশে দুটো পেয়ারা। সে বলল—দিদি, মনখারাপ করিস না। ঠামমা আবার আসবে, দেখিস।

নূপুর হেসে বলল—ঠিক বলেছিস, ওই বুড়িমা আমাদের ঠামমা।

মঠ সংবাদ

এবার ভালো রেজাল্ট করেছে শময়িতা কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রীরা

এবছরও শময়িতা কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রীরা ভালো রেজাল্ট করেছে। সিবিএসই বোর্ডের দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষায় স্কুলের সব মেয়েই কৃত্বিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে, বেশ কয়েকজন যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট করেছে।

বোর্ডের দশম শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছিল স্কুলের মোট ৫০ জন ছাত্রী। সকলেই ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করেছে। ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে তেরো জন। ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে তিনজন। ৯১.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী নবমিতা চট্টোপাধ্যায়।

বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছিল মোট ৩৭ জন ছাত্রী। প্রত্যেকেই ভালোভাবে পাশ করেছে। ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে নয় জন। ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে তিনজন। আর্টসে ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে ইপ্সিতা সীট, সায়েন্সে ৮৫.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে পায়েল দাঁ।

পরমারাধ্য প্রভুজী দু-দশকেরও বেশি সময় আগে বাঁকুড়ার এই মফস্বলে রণবহাল গ্রামে স্বপ্ন বপন করেছিলেন। গ্রামের মেয়েরাও আধুনিক বিশ্বে পা ফেলবে আপন মহিমায়। গ্রামের পিছিয়ে পড়া ধুলোপথের কন্যেটিও জেগে উঠবে একদিন, স্পর্ধায় মাথা তুলে দাঁড়াবে, এই ছিল প্রভুজীর স্বপ্ন। পরমপিতার আশীর্বাদে সকলের সহযোগিতা এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শময়িতা কনভেন্ট স্কুল আপন লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। একটু দূরে কোড়ো পাহাড়, স্কুলের পাশেই কুলুকুলু বয়ে চলেছে ক্ষীণস্রোতা শালি নদী। নদীর ওপারে শময়িতা মঠ, প্রভুজীর প্রিয় বেদান্তকুটীর। প্রকৃতির কোলে নম্র ধ্যানগম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে এই স্কুল। শুধু গতানুগতিক সিলেবাসের পড়াশুনা নয়, ভালো নম্বর পাওয়া নয়, শময়িতা কনভেন্ট স্কুলের লক্ষ্য হল 'পূর্ণ বিকাশ, অন্তর্গত সত্তার পূর্ণ প্রকাশ'। শময়িতার ছাত্রীরা আত্মজাগরণে আপন শক্তিতে প্রত্যেকে হতে চায় পূর্ণ মানবী, জাগ্রত 'শময়িতা'। আত্মিক সাধনা, নিয়মনিষ্ঠা এবং আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে বিজয়িনী হস্টেলে থাকে প্রায় তিনশো ছাত্রী। ডে-স্কলার এবং হস্টেলের ছাত্রীদের সমন্বয়ে শময়িতা কনভেন্ট স্কুলে নিত্য মহোৎসব। এই উৎসবের আবহে ছাত্রীরা প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে ভালো রেজাল্ট করে এগিয়ে যায়, এ বড়ো আনন্দের। পরমপ্রিয় প্রভুজীর স্নেহ আশীর্বাদে প্রত্যেকের জীবন পূর্ণভাবে বিকশিত হোক, এই প্রার্থনা।

মঠ সংবাদ

সুধা ওয়ার্কসপ

অসম্প্রতি ৭ জুন ২০১৮ তারিখে বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের 'শময়িতা মঠ'-এর উদ্যোগে হয়ে গেল সুধা নিয়ে একটি ওয়ার্কসপ। প্রায় ৫০ জনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন Organization-এর কর্মীরা। আর ছিলেন BCKV Professor Dr. Benukar Biswas এবং M.SC. Agriculture-এর ছাত্রছাত্রীরা। বিভিন্ন Organization-এর মধ্যে ছিল ASA, DRF, Horsa Trust, CINI Tata, LKP-এর মতো নামকরা Organization-এর কর্মীবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার কৃষি বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিক। যেমন--- ADA গঙ্গাজলঘাটি, ADA শালতোড়া এবং District Officer শঙ্কর দাস। আর ছিলেন শময়িতা মঠের কর্মীবৃন্দ এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত কৃষকরা।

সভায় প্রফেসর বেনুকর বিশ্বাস বলেন, অনিশ্চিত আবহাওয়ায় সুনিশ্চিত ধান চাষই হল সুধা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অনিশ্চিত বর্ষার ধান চাষ করতে কৃষকদের বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের এবং রাজ্যের এখন এই ধানচাষই ভরসা। তাই এই সমস্যার অন্যতম সমাধান হচ্ছে এই 'সুধা' পদ্ধতিতে চাষ। তিনি আরও বলেন, এই সুধা পদ্ধতিতে ধান চাষ করার উপায়—প্রথমে ১ বিঘা জমিতে ধান লাগানোর জন্য ১ কাঠা জমিতে বীজতলা করতে হবে, এতে শুকনো বীজতলার জন্য ১.৫ কেজি ও ভেজার জন্য ১ কেজি বীজ দিতে হবে।

১৫ ঝুড়ি গোবর সার, ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪ কেজি ফসফেট, ৩০০ গ্রাম পটাস, ২০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট ও ৭০ গ্রাম বোরাক্স দিতে হবে। এছাড়াও ১৫ দিন অন্তর ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া দিতে হবে।

ধান লাগানো (চারা রোপণ) :

২১-২৫ দিনের চারা লাগাতে হবে।

একসঙ্গে ১-২টি চারা লাগাতে হবে।

এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব রাখব ৮ ইঞ্চি এবং এক চারা থেকে অন্য চারার দূরত্ব রাখতে হবে ৬ ইঞ্চি।

মূল সার : বিঘা প্রতি ইউরিয়া ৬ কেজি, ফসফেট ৩৩ কেজি, পটাশ ৯ কেজি অথবা মূল জমিতে বিঘা প্রতি ২০ কেজি ১০-২৬-২৬ অথবা, মূল জমিতে ডিএপি ১২ কেজি, ইউরিয়া ১.৫ কেজি, পটাশ ৯ কেজি দিতে হবে।

চাপান সার : প্রথমবার ১৫-২০ দিনে পাশকাঠি ছাড়ার সময় ১২ কেজি ইউরিয়া ও দ্বিতীয়বার থোড় আসার সময় ৬ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে এবং সর্বশেষ চারা লাগনোর ১৫-২০ দিনের ও ১৫-৩০ দিনের মাথায় হাত দিয়ে বা মেশিন দিয়ে নিড়ান দিতে হবে।

এছাড়াও চাষিদের সুধা চাষে উৎসাহিত করতে শময়িতা মঠের নির্বাচিত জমিতে প্রথম ধাপ অর্থাৎ বীজ শোধন, বীজতলা তৈরি করা এবং বীজ ফেলা চাষিদের দেখানো হয় এবং প্রফেসর বেনুকর নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করেন। চাষিদের চাষের পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, তিনি একথাও বলেন। চাষিদের সুধা পদ্ধতিতে চাষ করার জন্য এবং উৎসাহিত করার জন্য এই বছর বীজতলার জন্য বীজ সার বিলি/দেওয়া হবে বিনামূল্যে।

এই সুধা পদ্ধতিতে চাষ করলে চাষিরা বীজতলাতে চারা গাছটিকে ৬০ দিন পর্যন্ত রাখতে পারবেন এবং ফলনও অনেক বেশি হবে। এরপর একে একে সুধা নিয়ে কর্মশালায় বাকি সদস্যরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এবং এই কর্মশালায় আগত চাষিরা খুবই আশাবাদী ছিল এই সুধা পদ্ধতি নিয়ে। গত বছর কিছু কিছু চাষি সুধা পদ্ধতিতে ধান করার অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেছিলেন ড. বেনুকর বিশ্বাস বলেন, পরবর্তীতে চাষে আরও উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে এবং এই ব্লক, রাজ্য ও দেশের প্রতিটি চাষি এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করবে এমনই আশা করা যায়।

চাষিদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 'শময়িতা মঠ'-এর অনবদ্য উদ্যোগ আশা করা যায় ভবিষ্যতে সুদূরপ্রসারী হবে এবং সাফল্য অর্জন করবে। ❑ অরিজিৎ

''কোনো দেবমানব, কোনো মহাপুরুষ কোনো যুগে, কোনো দেশে দিব্যজ্ঞান লাভের পথে নারীপুরুষের ভেদাভেদ নির্ণয় করেননি—কারণ আত্মা সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে স্বপ্রকাশ বোধীর আলো। —শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত

সীমা সেন, লালবাজার, বাঁকুড়া

''ধর্ম যদি কুহেলিকা, রহস্যপূর্ণ ধাঁধাঁ বলে মনে হয় তবে কেন আমরা বলি— 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'? সত্যের উদ্ঘাটন করেই তো মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীবে পরিণতি হয়েছে।'' —শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত

সুস্মিত রায়, দুর্গাপুর

''আহ্বান করি আত্মপ্রসারণের আলোকে নিজেকে আবিষ্কার করার সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্রকে মুক্ত করার—ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে মানুষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করার।'' —শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত

জনৈক ভক্ত, বিড়রা, বাঁকুড়া

''আজ যা প্রয়োজন, তা ধর্ম-যুদ্ধ নয়, ধর্ম-সম্মেলন, ধর্ম-মহামিলন। ধর্মের নামে জিগীর তুলে ধর্মকে যারা করতে চায় আচারসর্বস্ব, দেশসর্বস্ব, সম্প্রদায়সর্বস্ব, সেই কারাপ্রাচীর আজ ভেঙে ফেলতেই হবে।'' —শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত

সম্পন্না চ্যাটার্জী, কলকাতা

ভ্রমণ : পর্ব ৬

(জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পর)

বাংলাদেশ দেখে এলাম

শেফালি পাল

নদীর পাড় দেখে গেলাম শ্মশানঘাটে। চত্বরে ঢুকেই ডানদিকে বেশ বিরাট মন্দির ও মন্দিরের ভিতরে বিরাট কালীমূর্তি। লোডশেডিং থাকায় বেশি ভালো করে দেখা হল না। আবার গেলাম কালীপুজোর দিন সন্ধেবেলায়। সেদিন তো আলোর ঝলসানি, টুনি বাল্‌ব দিয়ে খুব সুন্দর সাজিয়েছে। মন্দিরের বারান্দায় মহিলাদের ভীষণ ভীড়। বারান্দার এক জায়গায় দেখছি সব মহিলাদের বাতি জ্বালার এমন ভীড় যে আমি আর চেষ্টা করলাম না। কোনোরকমে একটু 'মা'কে দেখে নীচে নেমে এলাম। কালীপুজো দেখতে যারা এসেছে তাদের মধ্যে হিন্দুই বেশি হলেও মুসলিম মহিলা ও পুরুষরাও এসেছে। পাশে একটা মেলাও বসেছে। মন্দিরের পাশেই একটা বড়ো মতো জায়গা, সেখানে শবদাহ করা হয়। সেখানে গেলাম, ওখানেও হিন্দু মহিলাদের বাতি জ্বালানোর ভীড়। আমি ভীড়ভাট্টা থেকে সরে এসে এক জায়গায় বসলাম। শ্মশানের একটু দূরে মোটামুটি বড়ো একটা স্টেজ করা হয়েছে। ওখানে এক ভদ্রলোক চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তার মাঝে মাঝে দু-জন মহিলা শ্যামাসংগীত করছিলেন। বেশ ভালোই লাগছিল গান শুনতে। তাই বসে বসে শুনছিলাম অনেকক্ষণ। পুজো হবে অনেক রাত্রে। সকালে ভোগ বিতরণ হবে। ওখানে কিন্তু কোনো বাজির আওয়াজ নেই। কলকাতায় যেমন বাজির আওয়াজ, তুবড়ি জ্বালানোর রেওয়াজ, নানারকম দামি বাজির ঝলসানি, আকাশ যেন আলোয় ভরে যায়। ঘণ্টা দেড়েক ওখানে কাটালাম। মাঝখানে একদিন গেলাম ইস্কন মন্দিরে। মন্দিরটা নতুন হয়েছে। ওখানে আরতি দেখলাম। তারপর কয়েকটা মন্দির দেখলাম, তার মধ্যে একটা মন্দিরে দেখলাম ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত দু-চারটা সুন্দর মূর্তি। তার মধ্যে একটা হল অদ্বৈতানন্দের। মূর্তিগুলো খুব ছোটো ছোটো। এরকম মূর্তি বোধহয় আগে কোনোদিন দেখিনি। তাই খুব ভালো লাগল। এখনও যেন চোখে ভাসছে। কালীপুজোর পরের দিন আমি গেলাম দিনাজপুর জেলার একটা জায়গায়, নাম 'গোবিন্দগঞ্জ'।

সিরাজগঞ্জ থেকে এক সপ্তাহের জন্য যাওয়ার কথা গোবিন্দগঞ্জ। কালীপুজোর পরেরদিন ভোরবেলা থেকে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, তার সঙ্গে আবার বৃষ্টি। কিন্তু গোবিন্দগঞ্জ থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে। সুতরাং দুপুরের খাওয়া সেরে ওই বৃষ্টির মধ্যেই গাড়িতে উঠলাম। রাস্তায় প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি চলছেই। কোনো লোকের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, রাস্তার দু-পাশেই মাঠ। ওখানে হয়তো চাষবাস হয়। গাড়ি এগিয়ে চলেছে গোবিন্দগঞ্জ অভিমুখে। বগুড়া জেলার ওপর দিয়ে যেতে হয়। বগুড়ায় বোধহয় একটু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। ওই জেলায় ভালো কলেজ ও ভালো হাসপাতাল আছে। তাই আশেপাশের জেলা থেকে অনেকেই যায় পড়াশুনা ও চিকিৎসা করতে। মোটামুটি একটু নামকরা ডাক্তররা থাকেন। ওখানে অসুবিধা হলে তখন ঢাকা শহরে রোগীকে নিয়ে যেতে হয়। ওদেশে অটোরিক্সা, গাড়ি, বাস ইত্যাদি পেট্রোল ছাড়াও সি.এন.জি গ্যাসেও চলে। ওই গ্যাসটা বগুড়াতেই খুব বেশি পাওয়া যায়। বগুড়া জেলার ওপর দিয়েই আমাদের যেতে হবে। ওখানে গাড়িতে গ্যাস ভরা হল। আমাদের অটোকে ওখানে সি.এন.জি বলা হয়। গ্যাসের নাম থেকেই সি.এন.জি নামকরণ হয়েছে মনে হয়। কাছাকাছি যেতে হলে সি.এন.জি-র খরচটা বেশ কম।

গোবিন্দগঞ্জ যেতে চার ঘণ্টা সময় লাগে। আমাদের গাড়ি চলছে বৃষ্টিও চলছে। গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বেড়ে গেল। পৌঁছে তো গেলাম, গাড়ি থেকে নামব কী করে ভাবছি। একজন চারখানা ছাতা নিয়ে আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে কোনোরকমে রিক্সায় উঠলাম। সরু গলি দিয়ে রিক্সায় যেতে যেতে সরুতর গলিতে এলাম। তাই রিক্সা থেকে নামতে হল। এবার ছাতা মাথায় আস্তে আস্তে হাঁটছি গলি এবার সরুতর হল, এবার ছাতা বন্ধ করে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে বাড়ির গেটের দর্শন মিলল। গেট খুলে, মোটামুটি সাইজের উঠোন। শিউলি ফুলের গাছের নীচ দিয়ে উঠোন পার হয়ে মেন বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখি কারেন্ট বিভ্রাট। পর পর দেখতে দেখতে তো আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কোনো উপায় তো নেই। বেহাল অবস্থায় এক সপ্তাহ কাটাব কী করে। দু-রাত্রি পরে বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান হল।

পরের দিনও সারাদিন অঝোরে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। সারাদিন ঘরেই কেটে গেল। গাড়ি থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। কারণ ওখানের সরু সরু গলির নীচ দিয়ে ড্রেন গেছে। অনেক ড্রেনের নোংরা জল দাঁড়িয়ে গেছে এক হাঁটু। ওই দেশে নিকাশী ব্যবস্থা একেবারেই নেই। প্রথম দুদিন বের হতে পারিনি। মনে হল এ কোন দেশে এলাম রে বাবা। আমার মনে হয় বাংলাদেশ সরকার গ্রামের প্রতি কোনো নজরই দেয় না। লোকের বাড়ি তৈরির কোনো নিয়মকানুন নেই। যার যতটুকু জায়গা তার সবটাই বাড়ি। চারপাশে কোনো ছাড়ের ব্যবস্থা বা নিয়ম নেই। যার জন্য গলিগুলো এত সরু হয়েছে। তাতে করে এরকম দুর্ভোগ।

এর আগে করোটিয়া গ্রামে দেখেছি, একটু ধনী যারা, তারা পুরোনো টিনের বাড়ি ভেঙে দিয়ে বড়ো বিল্ডিং বানিয়েছে। বাড়ির ভিতরে মেঝে সব ট্রাইলস বসান। ঘরে দামি আসবাবপত্র, ঠাকুরের সিংহাসন অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য করা। আবার সিংহাসনের সামনে, ঠিক যেখানে পূজারী পূজা করবেন সেখানে সিমেন্টের ও পাথর দিয়ে এমন সুন্দর কাজ করা যে দূর থেকে দেখলে মনে হবে বিভিন্ন রঙের উল দিয়ে তৈরি একটা আসন। করোটিয়াতে প্রত্যেক দিনই কীর্তন শুনতে যেতাম এক একজনের বাড়িতে।

গোবিন্দগঞ্জ অতটা গ্রাম নয়। দোতলা তিনতলা বাড়ি আছে অনেক। কিন্তু রাস্তাঘাট বেশ নোংরা। ভেতরের সরু সরু গলির কথা আগেই বলেছি। গোবিন্দগঞ্জ গ্রাম ও শহরের মাঝামাঝি। তবে খুবই নোংরা, মেন রাস্তায় একটু বড়ো বড়ো দোকান আছে। এখানে দেখার মতো কিছুই নেই।

গোবিন্দগঞ্জে দিন কয়েক থেকে দু-দিনের জন্য গেলাম ঘোড়াঘাট। যেতে বাসে একঘণ্টা লাগে। বাস থেকে নেমে ভ্যানে যেতে হয় প্রায় কুড়ি মিনিট। মোটরচালিত ভ্যান। চারজন করে বসা যায়। আমার উঠতে একটু অসুবিধে হল। কিন্তু আর কিছু যান নেই এখানে। এ জায়গাটা পুরোপুরি গ্রাম কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পরদিন সকালে উঠে একটু রাস্তায় বের হলাম। হাঁটতে বেশ ভাল লাগছিল। দু-একজন মুসলিম মহিলা আমার দিকে দেখছিল। ছোটো ছোটো দুটো একটা ঝুপড়ি দোকান আছে, ওখানে বোধহয় কিছু কিনতে এসেছিল। ওরাও আমাকে দেখল, আমিও তাদেরকে একটু দেখলাম। তারপর আবার হাঁটছি। আমার বাঁদিকে একটা দোতলা বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আছে এক ভদ্রলোক ও এক মহিলা। আমাকে দেখেই বুঝতে পারছিল যে আমি ওদেশের লোক নই। তাই আমাকে জিজ্ঞেস করল যে আমি কাদের বাড়িতে এসেছি। আমিও উত্তর দিলাম। আমার সঙ্গে পাঁচ-সাত মিনিট কথাও হল। আমাকে বাড়িতে যেতে খুব বলছিল। আমি অবশ্য ভেতরে যাইনি। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বাড়িতে ফিরে এলাম।

(চলবে)

''প্রকৃতিকে কর আপন সঙ্গী। সে কখনো আঘাত হানে না, বিক্ষুব্ধ চেতনায় দেয় অনাবিল প্রশান্তি।'' —শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত— জনৈক ভক্ত
রবীন্দ্রপল্লী, অমরকানন

''সেবা নয় দয়া, সেবা নয় করুণা, সেবা নয় অনুগ্রহ, সেবা নয় কোন রাজনৈতিক ফ্যাশন, সেবা হল সাধকের সাধনালব্ধ প্রেম।''—শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত
অনিন্দ্য পালিত, কলকাতা

Printed and published by Anahata on behalf of Shamayita Math and printed at Shamayita Press, Ranbahal, Amarkanan, Bankura and Published at Shamayita Math, Ranbahal, Amarkanan, Bankura-722133
Ph. No. & Fax-(03241)265202 **Editor : Anahata • Jt. Editor : Sagnika**